স্কুল শিক্ষার হাল হকিকত ও কর্তব্যকর্ম

আমরা যেভাবেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটাকে বলিনে কেন, শিক্ষার উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতির চেষ্টা অবান্তর। এই শিক্ষা বলতে আমি সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উভয়কেই বুঝাতে চাচ্ছি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সাধারণ স্কুল-কলেজসহ মাদ্রাসাশিক্ষাকেও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। কারণ আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসা মিলিয়ে এ দেশের কমপক্ষে ছত্রিশ লাখ ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে। সেজন্য সাধারণ স্কুল-কলেজসহ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে, শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। আমি অনেক সময় একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখি। না লিখে গত্যন্তর থাকে না, তাই। সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে-না বলেই লিখি। সেই স্বাধীনতার পর থেকে আমরা অনেকবার অনেক পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে এনেছি, এখনো আনছি। বারবার অনেক বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছি। কিন্তু কেন জানি কাজের কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না। প্রজেক্টের টাকা খরচের কোনো অসুবিধা নেই– হাতে ফল পাওয়াতে অসুবিধা। লাভের লাভ কতটুকু হয়, প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন করলেই বোঝা যায়। আমরা প্রজেক্টের টাকা খরচ করতে হয় তাই করি, নিজেদের লোকজন সাথে নিয়ে খরচ করি। অর্জন কতটুকু হলো সে হিসেব অলক্ষ্যে রয়ে যায়। শেষে একটা দায়সারা গোছের কথা বলে দিন পার করি, দায়িত্ব ঝেড়ে-মুছে ফেলে দিই। তাই এদেশের শিক্ষার এই দৈন্যদশা। অনেক লেখার মধ্যেই অনেকবার লিখেছি যে, শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি পরিবর্তন করে কিংবা মানব জাতির উৎপত্তি ও এদেশের ইতিহাসে কার কতটুকু অবদান, আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির রূপ কেমন, তার বর্ণনা কম-বেশি করে বা বিকৃত করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না। কারণও অনেকবার বলেছি যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটা ক্লাসের প্রতিটা বিষয়ের সিলেবাস যথেষ্ট ভালো বা চলনসই। সমস্যাটা অনেকটাই প্রায়োগিক বা বাস্তবায়নের। এই সিলেবাসটা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষার মধ্যে পুরোপুরি তিনটি অংশ থাকতেই হবে– এক. শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী; দুই. শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী; এবং তিন. শিক্ষা মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক হতে হবে। এ তিনটি উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের ফল হবে একজন শিক্ষিত লোকের বৈশিষ্ট্য, অথবা বলা যায়, এই ত্রিমুখী শিক্ষা যে অর্জন করবে তাকে আমাদের সমাজে শিক্ষিত লোক বলবো। নিজের উন্নয়নে, সামাজিক ও দেশের উন্নয়নে সে অবদান রাখতে পারবে। এভাবে শিক্ষা দিতে গেলে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই তা শুরু করতে হবে।

আমি মনে করি, শিক্ষার পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গেলে অর্থাৎ বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে আমরা মাত্র দুটো বড় ও প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। একটি পরিবেশগত সমস্যা, অন্যটি শিক্ষকের মান ও ইচ্ছা সমস্যা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এদেশে ভালো শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশই বিলীন হবার পথে। শিক্ষক হতে গেলে তার মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান যেমন থাকতে হবে, আবার জ্ঞানান্বেষীও হতে হবে। সত্য কথা যত তিক্তই হোক বলে ফেলা ভালো। শিক্ষা মানের নিম্নগতির অন্যতম কারণও এই শিক্ষক ও পরিবেশ। অনেক বছর থেকেই শিক্ষার মান নিম্নমুখী শুরু হয়েছে। অনেক শিক্ষক নিম্নমানের শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, কেউবা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে অথবা পাঠবিচ্যুত হয়ে কর্মজীবন পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তাই শিক্ষার মানহীনতা এখন রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটা কাজেই প্রকাশ পাচ্ছে। এটা অপ্রিয় সত্য যে, কোনো স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় আসতে গেলে সরকারি বা এমপিওভুক্ত হবে এই আশায় মধ্যস্বত্বভোগীর পকেটে অনেক মাল-মসলা ঢালতে হয়। এছাড়া সরকারি বা এমপিওভুক্ত করতেও মাল-মসলা লাগে না– এ দেশে এটা অবান্তর। এভাবে অনেক নকল-করে-পাশ বা না-শিখেই-পাশ নিম্নমানের শিক্ষার্থী টাকা কিংবা মামা-খালুর জোরে শিক্ষক হয়ে শিক্ষাঙ্গণে ঢুকেছে। আমরা এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাপনা দিয়ে এ অপাঙ্‌ক্তেয় অনুপ্রবেশকে রোধ করতে পারিনি– এটা আমাদের অপারগতা। শিক্ষাঙ্গণে এদের পাল্লা এখন ভারী। তাদেরকে যত বেশি করেই প্রশিক্ষণ দেয়া হোক না কেন, কাঠ কখনো ইটে রূপান্তরিত হয় না। এখানেই সমস্যা। এ থেকে শিক্ষা এটুকুই যে, শেষ-বাজারের নিম্নমানের সবজি সাশ্রয় দামে কিনলে বা কুড়িয়ে পেলে যত তেল-মসলা খরচ করেই রান্না করা হোক না কেন, রাধুনী যত ভালোই হোক না কেন, রসনা তৃপ্ত হয় না, ব্যঞ্জন বিস্বাদ হতে বাধ্য। বাস্তবে আমরা এই বিস্বাদ ব্যঞ্জনকে কখনো কাঁচা নুন যোগ করে,

কখনো হলুদের রং মিশিয়ে, কখনো মুখের জোর খাটিয়ে সুস্বাদু করতে চাই। বাস্তবে কি এ-কাজ কখনো সার্থক হয়? তবুও শিক্ষক যত খারাপই হোক যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতো, মন দিয়ে পড়াতো, প্রশিক্ষণটা কাজে লাগাতো, শিক্ষাকে বাণিজ্যিকিকরণ না করতো, প্রাইভেট টিউশনির রমরমা ব্যবসা না ফাঁদতো, তাহলে পরিস্থিতির কিছুটা হলেও উন্নতি হতো। কিন্তু বিধি বাম। পত্র-পত্রিকা ঘাটলে, সোস্যাল মিডিয়া খুঁজলে দেখা যায় আমরা পচা কাদার পাঁকে পড়ে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছি আর হাঁপাচ্ছি। বলা যায়, 'দিল্লি হনুজ দুরস্ত'। বলতেও না পারি, সইতেও না পারি অবস্থা। বললেই 'খালু বেজার হয়'। 'স্বজাত বিদ্বেষী' বলে মানুষ আমাকে গালি দেয়। না বলে উপায়ও নেই। শিক্ষার উন্নতি তো এদেশের প্রতিটা সচেতন মানুষই চায়। শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জাতীয় উন্নতি কীভাবে সম্ভব? আমি নিজের উদ্যোগে অনেক স্কুলে সশরীরে গিয়েছি। পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক খবর বিশ্লেষণ করেছি। শিক্ষকদের এখন শুধু বেতন বাড়ানোর দিকে ঝোঁক। সরকারি এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের রাত-দিন ঐ একটাই চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে 'কীভাবে বেতন বাড়ানো যায়'। তাদের এ দাবির সাথে আমিও অনেকটাই একমত। তবে তাদের এই সুবিধা আদায়ের দাবি কখনো একমুখী হতে পারে না। শিক্ষাদানে তাদের আগ্রহ ও দায়িত্বের কথাটাকেও বিবেচনায় আনতে হবে। আমি 'কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে ডাকতেও' চাই না। অন্য কোনো পেশাজীবী ও শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ববোধ কি এক হওয়া উচিৎ? একজন নিম্নমানের শিক্ষক শিক্ষাঙ্গণে ঢুকলে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। কমপক্ষে ত্রিশ বছর ধরে এ নষ্টকর্ম চলতে থাকে। সুখের বিষয় যে, এসব নিয়ে চিন্তাধারা-বিশ্লেষণ এদেশে খুব কম করা হয়। এজন্যই রক্ষে। বেতন কম বলে দায়িত্বহীনতাকে আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। ক্রিকেট খেলার হারজিত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে। ফুটবল খেলার হারজিত নব্বই মিনিটের মধ্যেই বোঝা যায়। ভালো শিক্ষক বা খারাপ-বাতিল শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল ভালো হোক বা খারাপ হোক পরিণতি বুঝতে বেশ ক-বছর সময় লাগে। আমরা কাজে-কম্মে দূরদর্শী হতে বড্ড অনীহ। আমাদের অতীতের কর্মফল এখন আমরা দেখতে পারছি। ভালো দায়িত্বশীল শিক্ষক ভালো বেতনে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে পারিনি এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আশার কথা যে, সরকার ইদানীং সরকারি প্রাইমারি স্কুলে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেছে। তারা এবং আগে নিয়োগপ্রাপ্ত হাতে-গোনা কিছু মানসম্মত শিক্ষক প্রথমে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়েই শিক্ষাঙ্গণে থাকবে। সরকার এ কাজ অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে এ থেকে আমরা ভালো ফল পেতে পারি। তবে এ কাজে ইতোমধ্যেই আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি।

পরিবেশ ফিরিয়েও আমরা শিক্ষার অনেকটা উন্নতি করতে পারি। সে-কাজেরও অগ্রগতি আমরা করিনে, বাস্তবমুখী ফলপ্রসু কোনো ব্যবস্থা আমরা আমলে নিইনে। বাস্তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধানের অবস্থাও খুব খারাপ। অধিকাংশ শিক্ষক ও তত্ত্বাবধয়কের দায়িত্ববোধে ঘাটতি আছে। স্কুল কমিটিও তার মূল দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে নানাবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ও রাজনৈতিক (?) গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনযোগী থাকে। থানা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা-কর্মকর্তাদেরও খাতাকলমের কাজ ফেলে প্রতিনিয়ত অসংখ্য স্কুলের শিক্ষামানের তদারকি করা সম্ভব হয় না। এভাবেই প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাথাভারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। প্রাইমারি স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর তাই বর্তমান অবস্থা একটুও ভালো না। ভুগছে কোমলমতি অবুঝ ভবিষ্যত প্রজন্ম।

পরিবেশের কথা বলতে গেলে শিক্ষক নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গণ নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি, পাঠ্যসূচি নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে সামাজিক-রাজনৈতিক টাউটদের পদচারণা যতক্ষণ বন্ধ করা না যাবে, ততক্ষণ যে যত কথাই বলি, শিক্ষার এ দীনহীন অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে পরামর্শ দিতে শুনেছি, যতক্ষণ দম্পতি এইডসমুক্ত না হয়, ততক্ষণ সন্তানের জন্ম না দিতে। অথচ সব রাজনৈতিক দলই শিক্ষাঙ্গণ নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইনিয়ে-বিনিয়ে একটাই নীতিমালা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা করেছে যে, 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই'ই। এভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। পরস্পর বিপরীতমুখী ঘটনা ঘটা 'সম্ভাবনা তত্ত্ব' অনুযায়ীও অসম্ভব। 'চোরকে বলবো চুরি করতে আর সাধুকে বলবো সাবধান থাকতে'- এটা হয় না। অথচ এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে প্রজেক্টের নামে রাষ্ট্রীয় বিশাল অর্থসম্পদ ব্যয় করি, বিশাল অঙ্কের সরকারি ও

আধা-সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি পুষি, মুখে মুখে সাঁতার শেখায়; সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ ব্যয় করে নিজেদের সুবিধার্থে শিক্ষাঙ্গণে দলবাজ, ধান্দাবাজ, অনুগত সন্ত্রাসী তৈরি করি; আরো কত কি করি! আমাদের আত্মবিশ্লেষণ বড় প্রয়োজন। অভিভাবকমহলকেও দেখেছি তাদের অনেকেই শিক্ষা বোঝেন না। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে আত্মসচেতনতা অনেক কম। শিক্ষার পরিবেশ পরিবর্তন করতে হবে– এ ধরনের অভিব্যক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় নেই বললেই চলে। সে যাই হোক, আমি তো আর স্কুল-মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে বাতিল শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করে ছাটাইয়ের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারিনে। এতে আবার যে তদবিরের মাধ্যমে তারা এসেছিল সেই তদবির বাড়বে, একটা অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হবে, শিক্ষকদের একটা বড় অংশ কর্মহারা হবে। বরং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যতটা মান বাড়ানো যায়, সে চেষ্টা করে, পরিবেশের উন্নতি করে এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জোরদার করে যতটা কর্মসাধন করা যায় সেটাই উত্তম। এতে শিক্ষকদের কাজের দায়িত্ব নিয়ে সকল পক্ষের ভালোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা নিয়ে দলবাজী বন্ধ করে ক্রমশ জাত শিক্ষকদের হাতে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা ছেড়ে দিতে হবে।

প্রতিটা এলাকার স্কুল-মাদ্রাসাগুলো দেখভালের জন্য আমরা সেই সমাজ থেকে রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত নয়, অথচ সততা আছে ও সমাজসেবা করতে চায় এমন সরকারি/বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সুশিক্ষিত শিক্ষানুরাগীদেরকে কাজে লাগাতে পারি। পার্শ্ববর্তী কোনো কলেজের বয়ঃজ্যেষ্ঠ কোনো অরাজনৈতিক এক বা একাধিক শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারি। এদের নিয়ে একটা টীম তৈরি করতে পারি। জেলা ও থানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা ও জেলা প্রশাসক এ টীমে থাকবেন। সবাই মিলে একটা যুতসই পরিকল্পনা করবেন। এ টীমের সদস্যরা অভিভাবক-শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়বেন। অভিভাবকদের সচেতন সম্পৃক্ততা ছাড়া বর্তমান সময়ের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া কখনোই সম্ভবপর হবে না। এ টীম ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ককে সক্রিয় করবেন। ত্রিপক্ষকে নিয়মিত উপদেশ, নির্দেশনা দেবেন; অভিভাবকদের আত্মসচেতন করে তুলবেন। অভিভাবকমহলকে নিয়মিত স্কুল-মাদ্রাসায় এসে সন্তানের শিক্ষা-কার্যক্রমের অবস্থা দেখতে বলবেন। টীম শিক্ষাঙ্গণের দৈনন্দিন সার্বিক কার্যক্রম, শিক্ষাদান কার্যক্রম তদারকি করবেন। সুশিক্ষিত লোকজনকে নিয়ে ক্রমশই টীমে সদস্যসংখ্যা বাড়াবেন। সামাজিক দ্বন্দ্ব-কোন্দল-ফেসাদ এড়িয়ে চলবেন। একই সমাজে বসবাস করাতে সমাজশিক্ষার সার্বিক কার্যক্রম তদারকির কাজ তাদের জন্য সহজ হবে। পুরো কার্যক্রমকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখতে হবে। সর্বজনীন এসব কাজ দলীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ করলে ফল ভালো হয় না, এটা আমাদের বুঝতে হবে।

সমাজের সুশিক্ষিত অংশকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে পারলে, শিক্ষার উন্নতির কাজে তাদের এগিয়ে আনতে পারলে, তাদের মনে সমাজসেবার উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারলে আমাদের বিদ্যমান পুরো জনগোষ্ঠীকে এখনো সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করা অসম্ভব ও অবাস্তব কোনো কাজ নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই কামনা।

(১২ মার্চ ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।